মানিকের উত্তরকালের গল্প : একটি পরিচয়

ফটিক ঘোষ

১

কথাসাহিত্যের প্রাণ হল ইতিহাস ও দর্শন। মূল লক্ষ্য নান্দনিক অবশ্যই কিন্তু ইতিহাস বাদ দিলে সাহিত্যের আর কিছু থাকে না। সে রাজনৈতিক ইতিহাস হোক বা সমাজেতিহাস। ইতিহাসের মধ্যে একটা সমসাময়িকতা আছে। যথার্থ শিল্পী তাকে, সেই সাময়িকতাকে অবলম্বন করে তাঁর জীবন-দর্শনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাকে চিরন্তনত্ব দান করেন। মানিকের উত্তরকালের গল্প বলে যেগুলিকে আমরা ধরেছি তার বিষয়বস্তু একান্তই সাদামাটা। অধিকাংশ গল্প জুড়ে আছে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের ন্যূনতম সমস্যার সংকটের বিবরণ। বিশেষত খাদ্য-বস্ত্রের উলঙ্গ সমস্যাকে মানিক উপস্থিত করেছেন— যা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। আরও একটি বিষয় হল তার বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা। ফ্লাইওভার এবং শপিং মলের পাশে আজও কী আশ্চর্যভাবে টিকে আছে সেই গল্পের মানুষ ও তার নিবাবরণ দারিদ্র্য। একাধিক গল্পে খাদ্য-বস্ত্রের চরম সংকটের অবতারণা করা হয়েছে। কিন্তু গল্পগুলি বৈচিত্র্যহীন হয়নি কারণ বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রকম। ঘট নাধারণাও বিচিত্র। এরপরে মানিক যেটা ধরেছেন তা হল বাসস্থানের সমস্যা, যার সঙ্গে মিশে আছে দেশভাগ ও উদ্‌বাস্তু সমস্যা। একাধিক গল্পে দেখা গেছে অনির্বচনীয় হুন্ডি একজন দুজনের হাতে— পৃথিবীতে সুদ খাটে সকলের জন্য নয়— এবং এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে সবাই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।' (জীবনানন্দ দাশ : ১৯৪৬-৪৭) নারীর নারীত্ব বিসর্জনের ব্যাপারটি একাধিক গল্পে ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু এসবকে ছাড়িয়ে উঠেছে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মধ্যেকার প্রতিবাদী শক্তি। তার অন্তর্নিহিত যে মনুষ্যত্ব ও মানবতা— যা ছাড়িয়ে উঠতে চেয়েছে সমস্ত সামাজিক অন্যায় অবিচার প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে— একাধিক গল্পে মানিক তার পরিচয় দিয়েছেন। সেগুলি সবসময় যান্ত্রিক ইস্তেহার হয়ে উঠেনি। প্রতিবাদটাকে বাইরের জিনিস মনে হয়নি। মানুষের মধ্যেকার স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে তা উঠে এসেছে। মানিক চিহ্নিত করেছেন সমস্যাকে, অনুসন্ধান করেছেন তার কারণকে এবং প্রতিকারের উপায় হিসাবে প্রতিবাদকে উল্লেখ করেছেন। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যও উল্লেখ করার মতো। একান্ত পারিবারিক সমস্যা থেকে তেভাগা আন্দোলন তাঁর গল্পে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু গল্পের নামের ব্যাপারে মানিক সবসময় যত্নবান হননি। কয়েকটি নাম দেখালেই তা বোঝা যাবে— কোনদিকে, উপায়, কালোবাজারে প্রেমের দর, এদিক-ওদিক, একবাড়িতে, উপদলীয় প্রভৃতি গল্পগুলি তার প্রমাণ। মানিকের গল্পে উঠে এসেছে একটি নিদারুণ সংকট কাল। তাকে সুচিত্রিত করেছেন তিনি। তারই মধ্য থেকে মানবতার অপার মহিমার বিজয় ঘোষিত হয়েছে। মার্কসবাদে দীক্ষাই হয়তো তার কারণ। যা অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের যথার্থ দিশারী। এবং দরিদ্র মানুষের মূল শক্তির প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস। একাধিক গল্পে নিয়তির অনিবার্যতার মতো চরিত্রগুলির অসহায় আত্মসমর্পণ যেমন আছে তেমনি কোথাও কোথাও চরিত্রগুলি প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আপাত জয়লাভও করেছে। মানুষ ও তার সামাজিক সংকট এবং মানুষের প্রতিবাদী সত্তা এই তিনের সমাহারে মানিকের গল্পের মূল চালিকাশক্তি। মানিক অবশ্য একটা বিষয় দেখাতে ভোলেননি— যে অধিকাংশ মানুষের দুর্দিনেও মুষ্টিমেয় মানুষ সুখে থাকে। অসহায় মানুষের অসহায়তার সুযোগ নেয় তারা। ফুলে ফেঁপে ওঠে। অর্থাৎ বৈষম্য ও সংকট প্রাকৃতিক নয় সামাজিক। মানুষের সৃষ্টি অমানুষিক বর্বরতা।

'যে বাঁচায়' গল্পে এই দুই শ্রেণির পরিচয় স্পষ্ট। একদিকে রয়েছেন ধনঞ্জয় সরকার অন্যদিকে বাঙ্গাতলা গাঁয়ের নিরন্ন মানুষ। গাঁয়ের গৌরব ধনঞ্জয় সরকার। কলকাতায় ব্যবসা করে বড়োলোক হয়েছেন তিনি। তাঁর সহকারী মাধব দেশে ফেরে রিলিফ ওয়ার্ক চালাবার জন্য। ধনঞ্জয়ও স্থির করেছেন বাঙ্গাতলায় দুঃস্থদের খাদ্য বিতরণ করবেন। 'স্টেশনে ভিড় করেছিল একদল নরনারী যাদের দেখলেই মরণাপন্ন গাছের কথা মনে পড়ে যায়। মাধব তাদের জন্য কলকাতা থেকে চাল ডাল আটা ময়দা নিয়ে আসছে খবর শুনে তারা স্টেশনে ছুটে এসেছে।' অন্যদিকে অক্ষয়ের বোন নলিনী নৃসিংহবাবুর ছেলেটার সঙ্গে পালিয়ে গেছে খেতে না পেয়ে। মাকে সে পাঁচটা টাকাও পাঠায়। 'বাস' গল্পে দেখা যায় গোবর্ধনের স্ত্রী গোবর্ধনের জন্য নানুকে দিয়ে মুড়ি পাঠিয়েছিল। পেটের জ্বালায় নানুই সেটা খেয়ে ফেলেছে। 'অসংখ্যবার ক্ষুধার জ্বালা সয়ে সয়ে জ্বালাটা ভুলে যাবার অভ্যাস জন্মে গেছে গোবর্ধনের।' তাই সেদিন পেট ভরে খেয়ে ঘুম আসতে তার দেরি হল অনেক।

মানুষের একান্ত দুর্দিনেও দাম থাকে নারী শরীরের। গ্রাম ছেড়ে সদরে গেলে তার বিনিময়ে খাদ্য বস্ত্রের সংস্থান হয়। 'আজ কাল পরশুর গল্প' - তে রামপদর বউ মুক্তা এভাবেই ঘর ছেড়ে সদরে গিয়েছিল। অবস্থা পরিবর্তিত হলে আবার স্বামীর কাছে ফিরে আসে সে। কিন্তু সমাজ ব্যাপারটাকে সহজে মানতে চায় না। এ নিয়ে গল্প। সমাজ তাকে শাসিয়েছে বউকে ঘরে নেওয়া চলবে না। না খেয়ে রোগে ভুগে কত মানুষ মরে গেল। কত পরিবার নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কত মেয়ে বউ চালান হয়ে গেল কোথায়— সুতরাং মুক্তোর বিচারে অবকাশ কোথায়? তবু বিচার সভা বসে। ঘনশ্যামের মতো মাতব্বররা তার হোতা। কিন্তু সাধারণ মানুষ সবাই আহত উৎপীড়িত। মন ভাঙা দেহ ভাঙা। আজ কী করে বাঁচা যায় কাল কী হবে — এ ভাবনায় বিব্রত সকল মানুষ গোট পাকাবার অবকাশ পায় না। তবু বিচার সভায় সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিবাদী সত্তাকে স্পষ্ট করতে ভোলেননি লেখক। বনমালী চেঁচিয়ে বলে — 'বটে? কোনো দোষ করেনি, তবু বিচার হবে দোষ করেছে কী করেনি?' গলা মেলায় করালী। বিশৃঙ্খলার মধ্যে জমায়েত শেষ হয়। ঘনশ্যাম বোঝে অবস্থা বদলেছে। 'ভয় দেখানো, জবরদস্তি, মিষ্টি কথা, লোভ দেখানো, বানানো কথায় ভোলানো কিছুই খাটবে না।' পীড়িত সাধারণ মানুষের সর্বসংস্কার মুক্তি, ভয় মুক্তির এক অসাধারণ আলেখ্য রচিত হয়েছে।

'দুঃশাসনীয়' গল্পের বস্ত্রাভাবের কাহিনি আজ কেমন অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু সেদিনের পটভূমির সঙ্গে আজ দীনদরিদ্র পল্লির তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের অনেকের জীবনের খানিকটা হলেও মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। তাদের কাপড়ের সমস্যা এতখানি প্রকট না হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যে নেহাতই কম তা বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া বোঝা কঠিন। এক একটি পরিবারের

এক একজন করে পালা করে বাইরে বেরোয় কারণ বাইরে বেরোবার মতো আবরণ তাদের একটিই। মনে হয় — 'হায়, ধুলো মাটি ছাই কাদা মেখে যদি আড়াল কার যেতে মেয়েমানুষের লজ্জাজনক পোড়া দেহের লজ্জা।' রাবেয়ার গায়ে উঠে আসে পায়খানার চটের পর্দা। ভোলা নন্দী কোমরের ঘুনশির সঙ্গে দু-আঙুল চওড়া পট্টি এঁটে তার পাঁচহাতি ধুতিখানি বাড়ির মেয়েদের দান করেছে। এ সংকট কি সামগ্রিক? না। 'কাপড় যদি নেই। ঘোষবাবুর বাড়ির মেয়েরা এ বেলা ও বেলা রঙিন শাড়ি বদলে নিয়ে পরে কী করে, আজিজ সাহেবের বাড়ির মেয়েরা চুমকি বসানো হালকা শাড়ির তলায় মোটা আবরণ পায় কোথায়?' আর প্রতিবাদ? খালি গুদামে কেন অনেক শ গাঁট, ধুতি শাড়ি জমে আছে এসব তথ্য আবিষ্কার করায় বঙ্কু আর তার সাতজন সাঙ্গ-পাঙ্গ মারপিট, দাঙ্গা-হাঙ্গামার দায়ে হাজতে আছে সোয়ামাস। এসব কিছু উত্তর দিয়েছে রাবেয়া। 'কাপড় যে দিতে পারে না এমন মরদের পাশে আর শোবে না বলে... পুকুরের জলের নীচে, পাঁকে গিয়ে শুয়ে রইল।'

'নমুনা' গল্পেও দেখা যায় মেয়ের বিনিময়ে অন্ন পাওয়ার উপায় আছে। চারপাশের অন্ধকারে আলোর ফুলকির মতো কালাচাঁদরা আসে। পরিত্রাতার ভূমিকায় আবির্ভূত হয় তারা। তারপর গ্রামের সেই মেয়েকে নিয়ে তারা নারীমেধ ব্যবসা শুরু করে। এই ঘটনা অহরহ ঘটে বলেই লেখক হয়তো বা গল্পের নাম দিয়েছে 'নমুনা।' কালাচাঁদ ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েও লাভ করেচে। গাঁ প্রায় উজাড় হয়ে গেছে। বেঁচে যারা আছে তারাও জীবন্ত নয়। আর অন্ধকারে ভূষণ মামার মেয়ে রতন গোপালের হাত ধরে, বলে, 'চাল এনেছো তো? আজ আগে চাল দেবে, তবে ছুঁতে দেব। মাইরি বলছি কানাইবাবু—'

'রাঘব মালাকার' গল্পে কাপড় - চোরাচালান— তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং কাপড় পেয়ে বস্ত্রহীন লোকেদের নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কাহিনি রয়েছে। গৌতমের কাপড়ের চোরা কারবার রাঘব টের পায়। গৌতমকে সে জানায় — কাপড় 'সদরেই তো বেচছ বাবু। গুদোম করেছ মালদিয়ায়।' তারপর একসময় জানিয়ে দেয়, এ কাপড় মোদের চাই। 'মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর? মা-বুন-ন্যাংটো, মেয়ে-বউ ন্যাংটো—' রাঘবের ডাকে অজস্র মানুষ জড়ো হয়। তার মধ্যে অনেকে বলে এ হাঙ্গামায় নেই তারা। গৌতমকে ছেড়ে দেয় তারা— সে কথা দেয় পুলিশকে কিছু বলবে না সে। তারপর পুলিশ আসে। কিন্তু তার আগে লুট করা কাপড়ের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে জোরালো দাঙ্গা বাধে। দুজন খুন হয়। রাঘবের মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। 'যাকে ঘুষ দিতে হয়' গল্পে মাখন কনট্রাক্ট পাওয়ার জন্য নিজের স্ত্রী সুশীলাকে দাসের কাছে উপঢৌকন দিয়ে আসে। অত স্পষ্ট করে যদিও একথা বলা নেই গল্পে— কিন্তু তাই ইঙ্গিতটুকু আজও কেমন প্রাসঙ্গিক কদর্য নিষ্ঠুর বাস্তব। 'প্রাণের গুদাম' গল্পে একদিকে নিদারুণ খাদ্যাভাব অন্যদিকে গুদামভরা খাদ্যদ্রব্য। সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে রাখা? শশাঙ্কর ভাবনার মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা চমৎকার ধরা পড়েছে গল্পে। খাদ্যের চোরাচালানের সংবাদও রয়েছে। শশাঙ্ক করুণার অবতার হয়ে এক ভিখারিনির ছেলেকে একটু দুধ দিয়েছিল। পরের দিন সেই মৃত শিশুকে শশাঙ্কের কাছে নামিয়ে রেখে বলে : 'তোমার দুধ খেয়ে মরেছে বাবু।'

'খতিয়ান' গল্পে দুই জাতের দুই শ্রমিকের দাঙ্গার পটভূমিকায় নিজেদের স্বরূপ বুঝে নেওয়া বৃত্তান্ত। বস্তি পুড়ে। মানুষ পুড়ে। এমনি মরা মানুষ পড়ে থাকার রাস্তায়। কয়েক দিন পরে দুজনে মেলে কারখানার গেটে। কারখানার কাজে বাদ পড়ে তারা। তারা উপলব্ধি করে:

দেখলি তো? আমরা শালা গরিবরাই মরলাম।

না তো কি? কে মরবে তবে?

ওনারা সব ঠিক আছেন বহাল তবিয়তে।

বল শালা তোর কোন জাত নেই। আমার কোন জাত নেই। তুই গরিব, আমি গরিব।

আমরা গরিবের জাত।

বন্ধু মাথা নেড়ে সায় দেয়। — ঠিক

আপাতদৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্তকে যান্ত্রিক মনে হতে পারে। কিন্তু গল্পের কার্যকারণ পরম্পরায় তা বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে।

'ছাঁটাই রহস্য' 'চক্রান্ত' এই দুটি গল্পে কাজ হারানো মানুষের ক্ষোভ বেদনা অসহায়তা ধরা পড়েছে নির্মম বাস্তবতায়। অবশ্য কোথাও তারা বিদ্রোহ করা পর্যায়ে পৌঁছোয়নি।

একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাবে। একটা সামন্ত্রতন্ত্র থেকে বুর্জোয়াতন্ত্রে উত্তরণের অনিবার্য দিক। 'একান্নবর্তী', গল্পে ভাইদের পৃথক হয়ে যাওয়ার গল্প আছে। আবার সমাজতন্ত্রে যৌথ খামারের কথাওতো বলা আছে। 'একান্নবর্তী' গল্পে লেখক সেরকম এক নিদান দেন। যৌথভাবে বাঁচার স্বপ্ন কল্পনা ঝিলিক দিয়ে যায়। কিন্তু গল্পটা তেমন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না।

'ছিনিয়ে খায়নি কেন' এবং 'ধান' গল্পে সেই অন্নাভাব, মানুষের দুর্গতি অসহায়তা, জমিদার আড়তদারদের পোয়াবারো অবস্থা, একদিকে গুদামে ধানচালের জমে থাকা, নষ্ট হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পে যোগীর উপলব্ধি : 'সেদিন বুঝলুম। বাবু কেন এত লোক না খেয়ে মরেছে, এত খাবার হাতের কাছে থাকতে ছিনিয়ে খায়নি কেন। একদিন খেতে না পেলে শরীরটা শুধু শুকোয় না, লড়াই করে ছিনিয়ে খেয়ে বাঁচার তাগিদও ঝিমিয়ে যায়। দু-চার দিন একটু কিছু খেতে পেলেই সেটা ফের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। দু-দিন খেতে না পেলে ফের ঝিমিয়ে যায়।' এ গল্পের নাম থেকে বোঝা যায় এই সংকট এমন যে মানিক একে নিয়ে শিল্প করতে চাননি। সোজাসুজি একটা প্রশ্নবাণ যেন ছুঁড়ে দিয়েছেন। 'ধান' গল্পে হালদার বাড়িতে ধান কিনতে আসে গাঁয়ের ক্ষুধার্ত মানুষ। ধান পায় না। হালদার তাদের জানায় ধান বেচে দিয়েছে। আড়তদার নারায়ণের উপরে মানুষ খেপে যায়। পুলিশ আসে। নারায়ণকে সরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার তো লাইসেন্স আছে। কিন্তু সে দানের কী হয়? 'তারপর একদিন সদরে চালান দেবার ব্যবস্থা হলে চালাটার দরজা খুলে দেখা যায়, ধানগুলি পচে গেছে।' এমনকী কবিগানের আসরেও দুর্ভিক্ষের কথাই প্রাধান্য পায়। 'গায়েন' গল্পে — 'করুণ হয়ে ওঠে নরহরির মরণের গান, হৃদয়ে মোচড় দেয় তার রসালো, ঝাঁঝালো পদগুলি, কিন্তু চোখে জল আনে না, কাঁদায় না। অসহায় হতাশা ফেটে যাবার উপক্রম করে না বুকে। ক্রোধে, ক্ষোভে তপ্ত হয়ে ওঠে নিশ্বাস, হাতগুলি যেন এগিয়ে যেতে চায় নরহরির ডাকেই সায় দিয়ে শিশুখেকো মেয়েখেকো মানুষখেকো রাক্ষসগুলির টুঁটি ধরে টেনে ফাঁসি লটকে দিতে—'

'পারিবারিক' এবং 'ধর্ম' নিছকই পারিবারিক গল্প। তবু ধর্ম গল্পে পরিবারের গণ্ডি ছড়িয়ে যায় সদস্যদের ভাবনায়। 'শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরেও তারা রাত জেগে কথা বলে। পরের বাড়ির নতুন আবেষ্টনীতে যেন নতুন করে তাদের বিয়ে হয়েছে। সুখদুঃখের কথাই বলে। নিজের নিজের নয়, অনেকের সুখদুঃখের কথা। 'আপদ' গল্পেও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এসে দাঁড়ায় চাল আটার অভাব — সংকট। দাম্পত্যকে অতিষ্ট করে দারিদ্র্য। 'সখী' গল্পেও সেই অভাব সেই আতঙ্ক নিরাশা। দুই সখীর কথোপকথনে একটি সময়ের একটি ভাঙাচোরা সমাজের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'ফেরিওয়ালা' গল্পেও সেই অভাব সেই দারিদ্র্য সেই সংকট। 'সংঘাত' গল্পেও ভারবাহী পশুর মতো জীবনের একই গ্লানি : 'শৈলর একখানি শাড়ি দু খণ্ড করে সে লুঙ্গির মতো পরে। কাঁধে ময়লা দুর্গন্ধি গামছা। শৈলর মোটে একখানি কাপড় সম্বল, সারাদিন পরে, লোকের বাড়ি কাজ করে, রাঁধে বাড়ে — সবই করে। রাত্রে শোবার আগে গা ধুয়ে ছেঁড়া ন্যাকড়া গায়ে জড়িয়ে কাপড়খানা কেচে মেলে দেয়।' এর মধ্যেই আছে শৈলর প্রতি মাখনের সন্দেহ। আছে নিজেকে বিক্রি করার প্রস্তাব এবং তার থেকে মুক্ত হয়ে অন্য জীবনে উত্তীর্ণ হওয়ার গল্প।

কিন্তু মধ্যবিত্তের জীবন যন্ত্রণা, সংকট, সংগ্রাম মানিকের অধিকাংশ গল্পে ঠাঁই পেয়েছে। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন — মধ্যবিত্ত সমাজের কাতরানি গভীরভাবে মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভেবেছিলাম ক্ষতেভরা মুখখানাকে আয়নায় তুলে ধরলে সমাজ চমকে উঠে মলমের ব্যবস্থা করবে। 'মহাকর্কট বটিকা' গল্পে হারাণ টি বি রোগে আক্রান্ত হয়। লতাকে বলে অহেতুক চিকিৎসা করে সর্বস্বান্ত না হতে। বাড়িওলা বলে অন্য ঘরে উঠে যেতে। প্রতিবেশীরা চায় ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে। এর মধ্যে মানবিকতার মুখ দেখা যায় বাড়িওয়ালা ছাতে একাট শেড তুলে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়। আর লতা ফুটপাতে বিক্রি করতে বসে, যক্ষা নিবারণী মহাকর্কট বটিকা। 'একবাড়িতে' গল্পেও সমস্যা আবাসের। বিলাসময়ের বাড়িতে ভাড়া আসে বন্ধু সুধীর। তারপর সেই বন্ধুত্ব কীকরে বিনষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত মারামারির পর্যায়ে পৌঁছোয়— এ তারই গল্প। বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে গেছে এখানে। নিবাররণ নিম্ন মধ্যবিত্তের বাস্তব চেহারা উন্মোচিত হয়েছে। 'চিকিৎসা' গল্পে কুমুদ ড্রাইভার ভূপেশের বাড়িতে গাড়ি চালিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু পরে সেই 'পাপের চাকরি' ছেড়ে দিয়ে সে মুক্ত ও সুস্থ হয়ে যায়। 'মীমাংসা' গল্পে পঙ্কজ ও বিভার পারস্পরিক বোঝাপড়া আপাত-অবাস্তবতার আড়ালে প্রেম মনস্তত্ত্বের এক স্বাভাবিক ছবি তুলে ধরে। পঙ্কজের কাগজ বাঁচে আর বিভাও তার পরিচিত একটি মানুষকে পায়।

'সুবালা' গল্পে উদ্‌বাস্তু স্বামী পরিত্যক্ত সুবালা ছেলেকে পাশে বসিয়ে ভিক্ষা করে। স্বামী হরেন এসে একদিন ছেলেকে নিয়ে যায়— 'পোলারে নিয়া তুমি ভিখ মাগবে। আমি সইতে পারি নাই।' তারপর হরেন নিজেই একদিন ছেলেকে সুবালার কাছে ফেরত দিয়ে আসে, তার পরনে ধোপ দুরস্ত কাপড়। মাঝরাতে পুলিশ হানা দিয়ে হরেনকে ধরে নিয়ে যায় 'শহরে অজস্র সম্পদ থাকা, অন্যের টাকা ছিনিয়ে নিয়ে নতুন সার্ট আর ফরসা ধুতি পরতে চাইলে চলবে কেন।' যাবার সময় হরেন বলে যায় — 'ভিখ মাইগো না। আমাগো অপরাধ নাই, ভিখ মাইগা অপরাধী সাইজো না। তার চেয়ে মরণ ভালো।' 'নিরুদ্দেশ', 'পাষণ্ড' দুটি গল্পই কাজ হারানোর গল্প। পরিবারে তার প্রভাব, স্ত্রীদের মনোবেদনা বিশাল সমাজে ব্যক্তি মানুষের অসহায়তা প্রকট হয়েছে। 'কালোবাজারে প্রেমের দর' গল্পে টাকাওয়ালা একজন মানুষের কাছে প্রেম ও বিবাহের পরাজয়ের কাহিনি বিবৃত হয়েছে। ধনঞ্জয় ও লীলার প্রেম ও বিবাহের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে নিরঞ্জন — লীলাকে বিয়ে করতে চায়। 'ধনঞ্জয় যদি ব্যাঘাত ঘটায় তবে বর্তমানের আশী হাজার এবং অদূর ভবিষ্যতে যা লক্ষাধিক টাকার কনট্রাক্ট দাঁড়াবে সেটা ফসকে যাবে ধনঞ্জয়ের হাত থেকে।'

২

উপরিল্লিখিত গল্পগুলিতে দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা সম্পর্কিত লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার রূপায়ন ঘটেছে। এখানে সমাজ ও পরিস্থিতির ভূমিকাই মুখ্য। চরিত্রগুলি যেন ওই পরিস্থিতির হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। তীব্র ঝড়ের ন্যায় ঘটনাধারা এসে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি মানিক আবিষ্কার করেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে। মার্কসবাদে দীক্ষিত মানিক মানুষের প্রতিবাদী সত্তাকে চিনেছেন তাকে গল্প স্থান করে দিয়েছেন। সেখানে মানুষগুলি কখনো এখকভাবে কখনো দলগত বা সংগঠনগতভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছে। এই প্রতিবাদী গল্পগুলি মানিক-সহিত্যের অন্যতম সম্পদ। কেননা মানুষ যে কেবল পরিস্থিতির শিকার হয় না— সে যে পরিস্থিতিকে পরিবর্তিত করতে পারে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে— এই স্বাভাবিক সত্য গল্পগুলিতে প্রতিভাত হয়েছে। মানুষের ভেতরের মনুষ্যত্ব এবং প্রতিবাদ শক্তি— দুয়ের সম্মিলনে চরিত্রগুলি এবং গল্পরস দুইই অনন্য হয়ে উঠেছে।

'মাসিপিসি' গল্পে দুই অসহায় বৃদ্ধার জীবনযুদ্ধের সঙ্গে যোগ হয়েছে স্বামী পরিত্যক্তা আহ্লাদীকে রক্ষার দায়িত্ব। স্বামীর অত্যাচারে হাত থেকে বাঁচাতে আহ্লাদীকে তারা নিজেদের কাছে রেখেছে। গ্রামের শাকসবজি শহরে বেচে তাদের জীবন চলে। কৈলাশ ডেকে জানিয়ে দেয় জঙ আহ্লাদীর স্বামী বলেছে — বউ না পেলে সে থানায় যাবে। মাসিপিসি জানায় মেয়েকে তারা মরতে পাঠাবে না জগুর কাছে। কিন্তু এমন সোমত্ত মেয়েকে ছিল-শকুনের হাত থেকে রক্ষা করাও বড়ো দায়িত্বের ব্যাপার। অবশ্য জামাই এলে তাকে অনাদর করে না তারা। কিন্তু সেই অত্যাচারের মধ্যে মেয়েকে ঠেলে দিতে পারে না তারা। এমন সময় এক রাত্রে কানাই এসে জানায় — মাসিপিসিকে একবার কাছারিবাড়িতে যেতে হবে। স্বেচ্ছায় না গেলে ধরে বেঁধে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবার হুকুম আছে। কিন্তু মাসিপিসি বঁটি আর কাটারি নিয়ে বলে এত রাতে তারা কিছুতেই যাবে না। একা লড়তে পারবে না ভেবে পাড়ার লোককে ডাকে তারা। এবং উপলব্ধি করে — 'বিপদে পড়ে হাঁক দিলে পাড়ায় এত লোক ছুটে আসে, এমনভাবে প্রাণ খুলে এতখানি জ্বালার সঙ্গে নিজেদের মধ্যে খোলাঘুলিভাবে গোকুল আর দারোগা ব্যাটার চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করতে সাহস পায়, জানা ছিল না মাসিপিসির।... কেমন একটা স্বস্তি বোধ করে মাসিপিসি। বুকে নতুন জোর পায়।' এখানেই মানিকের স্বাতন্ত্র্য অনন্যতা। তিনি মানুষের উপর ভরসা করতে শেখান। অত্যাচার যে শেষ কথা নয় মানুষই যে শেষ কথা বলে — এমন বার্তা তাঁর গল্পে সর্বত্র দেখা যায়। আবার তারা ফিরে আসতে পারে ভেবে মাসিপিসি যুদ্ধের আয়োজন করে আহ্লাদীকে মাঝখানে রেখে বিনিদ্র রাত কাটায়।

'পেটব্যথা' গল্পে একজন গরিব লোকের জন্য আরও অনেকের প্রতিবাদে সামিল হওয়া— শুধু তাই নয় অত্যাচারী কৈলাসকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ভৈরব সদরে ছাগল বেচতে যায়— ন্যায্য দাম পাবে বলে। গোরু ছাগুলের কারবারী কৈলাস এটা সহ্য করতে পারে না। সব গোরু ছাগল কেনার অধিকার তো তার। তাই সদরে ছাগল বেচে ফেরার পতে কৈলাশ ভৈরবের টাকা কেড়ে নেয়। তাকে চড় মারে। থানায় যাব বলে তার পেটে লাথি মারে। ভৈরব রক্তবমি করে। পথ চলতি যদু-মধুরা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। তারা তাকে হাসপাতালে আনে। কৈলাসের শ্রেণি-বন্ধু ডাক্তার সব শুনে বলে — কলিক হয়েছে। তেলেভাজা খাওয়ার জন্য। রাম শ্যাম যদু মধুরা বলে কিন্তু এই রক্তটা। কুঞ্জু ডাক্তার বলে কলিকেও রক্ত ওঠে। কৈলাসের লাথি মারার ব্যাপারটিকে উড়িয়ে দেয় কুঞ্জ ডাক্তার। ইতিমধ্যে রাম শ্যাম যদু মধুদের সংখ্যা বেড়ে যায় একটা গুঞ্জন উঠে। কিছু পরে— কুঞ্জু ডাক্তার যখন বাড়ি গিয়ে ঘুমের আয়োজন করছে— তখন বাইরের থেকে হাঁক আসে — আর একজন কলিকের রুগি এসেছে। ভয়ে বিবর্ণ কুঞ্জ ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে দ্যাখে, কৈলাস মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গোঙাচ্ছে। তার মুখ দিয়ে করত বেরুচ্ছে। আজ এ গল্প অবিশ্বাস্য ঠেকে। পৃথিবীটা আজ কৈলাসদের। আর রাম শ্যাম যদু মধুরা সব একক। কৈলাসদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তাদের গিয়ে মনে আশা জাগায়। ভৈরবের হয়ে কৈলাসদের শাস্তি দেবার জন্য রাম শ্যাম যদু মধুরা একদিন টিক এভাবে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

'শিল্পী' গল্পটি বহুচর্চিত। গল্পটিতে শিল্পী পরিচয়ের এক আশ্চর্য মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। সব শিল্পী যে রাজভবনে দাঁতন বেচতে যায় না মদন তাঁতি যেন তাই প্রমাণ করেছে। সুতোর আকাল। সবার মতো মজুরিতে সাধারণ কাপড় বুনতে না মদন তাঁতি তাঁতিপাড়ায় প্রবাদই আছে— মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে। কিন্তু ভুবনকে মদনের ঘরে দেখে তাঁতিপাড়ায় সকলে অবাক হয়। 'সে-ও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজি হল প্রায়- বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে?' মদনের মা আর বউ বাবুদের বাড়ি যায়। মেয়েদের ধরে মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে দু-একখানা ভালো কাপড়ের ফরমান আদায় করতে। সুতোর অভাবে তাঁতিপাড়ায় সমস্ত তাঁত বন্ধ। অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতিপাড়া থমথম করছে। সব ঘরে রোজগার বন্ধ উপোস। তবু মদন ওঁচা কাপড় বুনবে না। মদন যদি ভুবনের শর্তে রাজি হয় — তাহলে অনেক তাঁতি রাজি হবে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পাঠিয়ে দেয়। দেয় দাদনের দু টাকা, তা যেন চামড়ায় ছ্যাঁকা দেয়। তাঁত না চালিয়ে এদিকে সারা গায়ে ব্যথা। পেটে খিদে, গর্ভবর্তী বউ গোঁঙাতে থাকে। কী করবে মদন তাঁতী? তারপর এক রাত্রে মদন তাঁতির তাঁর চলে। সবাই অবাক হয়ে যায়। বেলা হতেই তাঁতিপাড়ায় সবাই মদনের ঘরে আসে। ক্রোধে ক্ষোভে তাদের কারে চোখে জল আসে। কিন্তু মদন উদিকে ডেকে তার হাতে ভুবনের সুতো ও টাকা দুটো তুলে দেয় — 'নিয়ে যা ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—' বুড়ো ভোলা জানতে চায় মদন কথার খেলাপ করেছে তাঁত চালিয়ে। কিন্তু মদন তাঁতি জানায়। —'চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম একটু। ভুবনের সুতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—' দারিদ্র্য মানুষকে অমানুষ করে। দারিদ্র্য আবার মানুষকে মানুষ করে। মদনের অন্তর্নিহিত শিল্পী সত্তার চমৎকার যেমন সামাজিক দায়িত্ব থাকে— সৎ থাকা, মানুষকে পথ দেখানো— মদন তাই করেছে। মদন যে যথার্থ শিল্পী এ নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

'টিচার' গল্পে গিরীনও একরকমের স্থির গূঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছে। স্কুলের সেক্রেটারি রায় বাহাদুর টিচারদের সদুপদেশ দেয়। স্বার্থ ভুলে, বিলাসের লোভ জয় করে বুনো রামনাথের আদর্শ নিয়ে যারা মানুষ গড়ার কারিগর সামান্য দুটো পয়সার জন্য তার অসভ্য মজুর ধাঙড়দের মতো হাঙ্গামা করবে রায় বাহাদুর তার স্কুলে তা করতে দেবে না। সে তার টিচারদের সদুপদেশ দেয়। হেডমাস্টারের কাছে জানতে চায়ল গিরীন উসকানি দিচ্ছে কিনা। এমন সময় গিরীন রায় বাহাদুরের বাড়িতে গিয়ে তার ছোটো ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন জানায়। রায় বাহাদুর যথাসময়ে যথাদিনে গিরীনের বাড়িতে উপস্থিত হয়। না অন্নপ্রাশন নয়। গিরীন রায় বাহাদুরকে তার দরিদ্রতম জীবন যাপনের ছবি দেখায় কৌশলে। বৃদ্ধ অসুস্থ বাবা, রুগ্ন বউ, অসুস্থ ছেলে, ময়লা দুর্গন্ধময় বিছানা, ঘুপসি ঘর। রায় বাহাদুরের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। গিরীনের বউকে সে কথা দেয় তার ছেলের চিকিৎসার দায়িত্ব সে নিল। কিন্তু পরের দিনই গিরীন বরখাস্তের নোটিশ পায়। ক্ষমতা থাকলে ফাঁসির হুকুম দিত রায় বাহাদুর। কিন্তু গিরীনের কি লাভ হল এতে? 'কিন্তু একটা কথা জানে গিরীন। রায় বাহাদুর ভুলতে পারবে না, তার ভয় করবে। শিক্ষাকদের দারিদ্র্যের মহাত্ম্য কীর্তন করে শোনাতে গিয়ে একটু আটকে আটকে যাবে কথাগুলি, উচ্ছ্বাসটা হবে মন্দা। দয়া-মায়া সহানুভূতিতে নয়, ভয়ে।' এও এক ধরনের প্রতিবাদ। গিরীন জানত তার চাকরি যাবে— কিন্তু কোটা দুর্দশাটা সে রায় বাহাদুরকে জানিয়ে দিতে ভোলেনি।

'একান্নবতী গল্পে যেন যৌথ খামারের ছায়। গল্পের বাস্তব ভিত্তিভূমি যদিও দুর্বল তবু স্বপ্নে অথবা বাস্তব প্রয়োজনে এমন একটা পরিবার গড়ে উঠে। এবং যে লক্ষ্মী একদিন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল— গল্পের শেষে যে উপলব্ধি করে : 'ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে সে মরতে গিয়েছিল কদিন আগে দিশেহারা হরিণীর মতো, আজ বাঘিনির মতো বাঁচতে শুধু সে রাজি নয়, বাঁচবেই এই তার জিদ।' 'ছিনিয়ে খায়নি কেন' গল্পে যোগী ইংরেজের জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মন্দ বস্তি থেকে হারানো বউকে ফিরিয়ে আনতে যে অন্তঃসত্ত্বা যোগী তার জন্মদাতা নয়। কিন্তু সে তো বাপক হবে তার পরিবারের বাচ্চারা। এও এ মহত্বে, এবং এক প্রতিবাদ— 'তার পরিবার খেতে না পেয়ে হারিয়ে গিয়েছিল তো? যেভাবে পরের খেতে পেয়ে নিজেকে বাঁচিয়েছে তো? তারপর আর কোনো কথা আছে?'

'হারাণোর নাতজামাই' গল্পটিও বহুপঠিত। তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা এ গল্প শিল্পের বিচারে সার্থক। কৃষক নেতা ভুবনকে বাঁচাতে তাকে নিজের জামাই সাজিয়ে মেয়ের সঙ্গে শুতে পাঠান— সর্ব সমস্যার জয় করে ময়নার মা পুলিশকে বোকা বানায়। 'এমন তামাশা কেউ কখনও করেনি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে।' তারপরে আসল জামাই আসে, অভিমানে রাগে তখন সে দিশাহারা। ময়নার মা তাকে বোঝায় ভুবন হল দশটা গাঁয়ের বাপ— কেননা সে অন্ন সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছে। জামাই জগমোহন তা মানতে চায়না। বসে বসে ময়নাকে কাঁদায়। ময়নার মা যে কাঠি কঠোর

চালাক কৌশলী— কৃষক আন্দোলন যা করে দিয়েছে— তাতেই ময়নার মায়ের পরিচয় শেষ হয়ে যায় না। তার মধ্যে আছে এক অপরূপ মাতৃত্ব। জামাইকে খাওয়ানোর জন্য সে পাড়ায় মুড়ি মুড়কি সংগ্রহে যায়—। জগমোহন ময়নাকে তিরস্কার করে কাঁদায়। 'বেড়ার বাইরে সুপারিগাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই!' এই অনুভূতি পুলিশকে জব্দ করার অপর পিঠ। তারপর সন্ধারাতেই পুলিশ হানা দেয়। মন্মথ ময়নার সঙ্গে কুৎসিত রসিকতা যখন করতে যায় থুতনি নেড়ে তখন জগমোহন লাভ দিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে বলে 'মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন।' বাড়ির সকলকে গ্রেপ্তার করে রওনা দেবার সময় মন্মথ দ্যাখে— 'দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে। জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড়ো হচ্ছে। মথুরার ঘর পার হয়ে পানা-পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত - আটগুণ বেশি লোক পথ আটকায়।' ভুবন আর ময়নার পরিবার— তাদের কাছে এক হয়ে যায় লড়াইয়ের সূত্রে। হারাণের বাড়ি লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে। 'মানুষের সমুদ্রের, ঝড় উত্থাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।'

'ছোটোবকুলপুরের যাত্রী' গল্পটিও স্বনামে খ্যাত। কারখানার ধর্মঘট নিয়ে হাঙ্গামা। তিনজন নেতাকে ধরে ট্রেনে চালান দেবার সময় কয়েকশো মজুর তাদের ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। এই নিয়ে গুলি চলে এবং রক্তপাত ঘটে। এ খবর শোনার পর দিবাকরের আধা চাষি আধা মজুর প্রাণটা বড়োই বিগড়ে আছে। সে চলেছে ছোটোবকুলপুরে তার আত্মীয় কুটুম্বের সন্ধান নিতে। কিন্তু গাঁয়ে ঢোকার আগেই কিছু লোকে তাকে পথ আটকায়। নানারকমের জেরা চলতে থাকে। তারপর আবিস্কৃত হয় দিবাকরের পানমোড়া কাগজ যেখানে বড়ো হরফের হেড লাইন— 'ছোটোবকুলপুরের সংগ্রামী বীরদের প্রতি।' গল্পটির গঠনরীতি চমৎকার। কিছু না বলেও কেমন করে অনেক কথা বলা যায়— কেমন করে আন্দোলনের একদিকে, অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ছবি ফুটিয়ে তোলা যায়— কেমন করে দিবাকর এবং আন্নারা মাঝখানে পড়ে অসহায় হয়ে যায়— তার জীবন্ত চিত্র মানিকের আর কোনো গল্পে নেই। 'হারাণের নাতজমাই' এর কৃষক আন্দোলন আর ছোটোবকুলপুরের শ্রমিক আন্দোলন দুইই মানিকের শ্রেষ্ঠগল্প। কাহিনি বর্ণনা, গঠন রীতি, সংক্ষিপ্ততা, আবেগ জাগানোর ক্ষমতা সাধারণ মানুষের বীরত্ব— এই দুই গল্পে চমৎকার শিল্পসুষমায় ভরে উঠেছে।

'বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে' গল্পে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব দেখান লেখক। ক্ষয়ে যাওয়া সামন্ততন্ত্রের শেষ রশ্মিপাত। নতুন যৌবনের দুঃসাহস গল্পে ধরা পড়ে। বাগ্‌দিপাড়ার নতুন যৌবন জানান দেয়— 'মোরা খাটি খাই, মোরা ছোটো কীসে, মেরা সজ্জাত হব। মোরা বজ্জাতি ধরম করম মানবো নাই।' শুধু তাই নয় সন্ন্যাসীর বানানো বেদি জল আটকে দুলেদের বর্ষাকালে বসবাসের অনুপযোগী করে তোলে। জমিদার স্বয়ং যে বেদি বানিয়ে দিয়েছিলেন। দুলেরা জানায় মজুরের জাতই খাঁটি জাত। বাকি সব বজ্জাত— কেননা তারা অন্যের অন্ন চুরি করে। দুলে নায়েব শ্রীমন্ত সরকারের ঘরে গিয়ে নালিশ করে। কারখানায় খাটতে যাওয়া ছোঁড়ারা বাগ্‌দিপাড়ার জাতকুল সর্ব নষ্ট করে দিচ্ছে। সে তার বিহিত করে দিতে চায়। বলে ঠাকুরের থানের বাঁধ কাটতে যায়। নিজেদের মানুষ বলে দাবি করে। 'নতুন আশা আর নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেয়ে কত অল্পদিনে কী অদ্ভুতভাবে যে প্রাণবন্ধ সচেতন হয়ে উঠেছে অন্ধকারে বন্ধ পশুগুলি!' বাঁধ কাটতে শুরু করে তারা। এমন সময় দুলে উন্মাদের মতো ছুটে গিয়ে চিৎকার করে সর্বনাশ হবে— ঠাকুর থানে কোদাল ছোঁয়ালি। পালা সব কত্তাবাবুকে খবর দিয়ে এসেছি পুলিশ আসছে মিলিটারি আসছে। তার এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি সে হাতে নাতে পায়। দুলালির 'খন্তার ঘায়ে মাথা ফেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে দুলে। রক্তে তার রুক্ষ কাটা চুলে চাপ চাপ জটা বাঁধতে তাকে। ঠাকুরের থানে নালা কাটা হলে বাড়তি বদ জলের স্রোত প্রবল বেগে বেরিয়ে যেতে আরম্ভ করলে সকলে ধরাধরি করে দুলেকে সেই স্রোতে ভাসিয়ে দেয়।' গল্পটির বিষয় তারাশঙ্করকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু পরিণামে দুই শিল্পীর পার্থক্য চোখে পড়ে। তারাশঙ্কর হলে দুলের জন্য আমাদের সমস্ত সহানুভূতি জমা হয়ে থাকত। কিন্তু মানিক সামন্ত্রতন্ত্র ও প্রাচীনের প্রতি সম্পূর্ণ নির্মোহ। দুলে যেন সমস্ত প্রাচীনের প্রতীক। বন্ধ জলার মতো সেও পচে গেছে। দুলালি তাই তাকে আঘাত করে। আর সকলে সেই বন্ধ প্রাচীনকে ভাসিয়ে দেয় চলতি স্রোতে।

'মেজার' এক অসাধারণ গল্প। লক্ষ্মীপুরের চাষি ভৈরব—যার রাগ মেজাজ ছিল একান্ত ব্যক্তিগত তা কীভাবে দলবদ্ধ হয়ে মেজাজের প্রকৃতি বদলে দেয়, সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইতে রূপান্তরিত হয় তারই কাহিনি 'মেজার'। দারোগাবাবুর চড় চাপড় ধমক সে সহ্য করে কিন্তু একটা বদ রসিকতায় দারোগার গালে সে চড় বসিয়ে দেয়। এজন্য তাকে জেল খাটতে হয়। বেগুন খেতে গোরু ঢোকার জন্য কানাইয়ের সাথে তার বচসা বাধে। লাঠির ঘায়ে সে কানাইয়ের মাথা ফাটিয়ে দেয়। গোরুটাকেও মেরে ফেলে এবং বলে প্রায়শ্চিত্ত সে করবে না। চার পয়সা সাগু সে ওজনে চায়। দোকানি ব্যঙ্গ করলে সে সাগু ছুঁড়ে মারে। প্রতিবেশীরা তার এই মেজাজকে ডরায় — ডরায় তার বউও। এসব লোককে নিয়ে বিপদ। রাগ হলে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসে নিজের ভালোমন্দের বিচার বিবেচনা পর্যন্ত লোপ পায়। তারপর একদিন এল লক্ষ্মীপুরের এই হাঙ্গামা। রাখালের চোরাচালানে এলাকায় ধান চাল উপে যেতে শুরু করলে গরিবেরা নিজেরা প্রতিকার করতে বসে। ভৈরব সেই আলোচনায় উপস্থিত থাকে। কিন্তু সে বলে আগেও লোকটাকে সবাই মিলে ফাঁসি দিতে হবে। বুড়ো বনমালীর ধমক খেয়ে সে সভা ছেড়ে চলে আসে। সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু এরপর গ্রামের লোককে দাবাতে শুরু হয় তাণ্ডব। রাখালের গুণ্ডারা পাড়ায় পাড়ায় হানা দেয়। একদিন ভৈরবের ঘরেও ঢোকে তারা। তাকে ও তার শিশু সন্তানকে দড়িতে বাঁধে। তার বউ কালির উপর সাতজন একে একে অত্যাচার করে। অদ্ভুত এই যে তারপরেই ভৈরবের মেজাজ আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে যায়। 'দড়ি খুলে দিলে যে খুঁটিকে ওকে তারা বেঁধেছিল তাতেই ঠেস দিয়ে ভৈরব মেঝেতে বসে পড়ে। মনে হয়, তার সামনে তার বউয়ের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার হয়ে গেল, তারই গায়ে গায়ে লেগে থেকে কচি ছেলেটা যে ওদের দড়ির ফাঁসে দম আটকে মরে গেল, এসব কিছুই সে গায়ে মাখেনি। তার রাগও নেই। হা-হুতাশও নেই।' আসলে তার মেজাজের প্রকৃতিগত একটি পরিবর্তন ঘটে যায়। গ্রামরক্ষী দলে সে নাম দেয়, কাজ করে, মন দিয়ে আলাপ আলোচনা পরামর্শ শোনে। মানুষকে তার কাহিনি শোনায়, বলে,'প্রতিকার করবে না? তুমি মোর ভাই?' তারপর সাতদিন পরে সেই গুণ্ডার দল যখন মাঝরাতে লোচন দাসের ঘরে হানা দিয়ে আরেক 'উৎসবের' আয়োজন করে

তখন ভৈরব তিনশো লোক নিয়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'কী ভীষণ যে দেখায় তখন তার মুখের চেহারা। দেখে বনমালী এবং আরও অনেকে বুঝতে পারে ভৈরবের মেজাজ কোথায় চড়েছে।'

'চিকিৎসা' গল্পে বড়োলোকদের ট্যাক্সি ড্রাইভার কুমুদ মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল তার অসৎকর্মের সহযোগী হয়ে। ট্যাক্সি চালানো ছেড়ে দিয়ে সে ওইসব অপকর্মের প্রতিবাদ জানায় এবং সুস্থ হয় নিজেও। 'অসহযোগী' গল্পে আড়তদার বাবার আড়ত থেকে চাল বের করে কাঙালি ভোজন করায় রমেন। গুদাম থেকে চাল বিতরণ করে। দূর দূরান্তের লোক এসে তা নিয়ে যায় বাবার পাপের প্রতিবাদ রমেন এভাবেই করে। 'একটি বখাটে ছেলের কাহিনি' গল্পে বখাটে সমরেশ কার্যত মজুরদের প্রতিবাদের সঙ্গী হয়ে উঠে। তার বন্ধু 'ভদ্র' কুমার কারখানা চালায়। সেই কারখানায় বখাটে সমরেশকে চাকরি দিয়ে তার বখাটেপনা বন্ধ করতে চায়। যৌন সমস্যা নিয়ে তাকে গবেষণা করতে বলে। কিন্তু সমরেশ স্পষ্ট জানায় : 'ভেবে দেখলাম যৌন অত্যাচারের হাত থেকে মানুষের উদ্ধার পেতে হলে প্রথম প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। মানুষ তার শ্রম খাটিয়ে ভালোভাবে বাঁচতে শিখলে অনেক গ্লানির পাঁক থেকে সে নিজেকে তুলে ধরতে পারবে।' 'উপায়' গল্পে উদ্‌বাস্তু সমস্যার জীবন্ত চিত্র আছে। সেদিন উপায় না পেয়ে কত নারী নরকে নেমে গিয়েছিল। সুযোগসন্ধানীরা কেমন করে সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়েছিল তার অনেক ছবি মানিকের নানা গল্পে এবং এ গল্পেও আছে। কিন্তু মল্লিকা প্রমথর এই ব্যবহার মেনে নেয়নি। 'মল্লিকার মাথায় হঠাৎ আগুন ধরে যায়। প্রথম তাকে দিয়ে ব্যবসা করাবে এটা সে মেনেই নিয়েছে কিন্তু গোড়ায় প্রথম নিজে তাকে কিছুদিন ভোগ করে নিয়ে তারপর ব্যবসায় নামাবে এ অপমান তার অসহ্য লাহে। হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুহাতে মদের বোতলটা তুলে সে প্রাণপণে প্রমথর মাথায় বসিয়ে দেয়।'

মানিক বাস্তবের শিল্পী, বাস্তব জীবনের শিল্পী, দুঃখ দারিদ্র্য জ্বালা অসহায়তা দৈনন্দিন জীবন যাপনের গ্লানি ও সংগ্রাম নিয়ে যে জীবন— তাকে এমন করে কোনো সাহিত্যিক রূপদান করেননি, মানিক জীবনকে অনাবৃত করে দেখিয়েছেন। কেবল মানুষের নূন্যতম প্রয়োজন খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান— তারই জন্য নিঃশেষিত জীবনীশক্তি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তত্ত্ব। গল্পগুলির পটভূমি এত বাস্তব নির্মম যে স্বপ্নের মোহাঞ্জন আর নয়নে লেগে থাকে না। ফুল খেলবার দিন যে আজ নয়— মানিক যেন তাই আমাদের বলেন। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন যন্ত্রণা একেবারে অনাবৃত করে দেখান মানিক। অবশ্য এসব কোনো নেতিবাচকতায় গিয়ে শেষ হয় না— জীবনে এত দুঃখ যন্ত্রণা কিন্তু কখনোই তা জীবন বিমুখ করে না পাঠককে। বরং জীবনের এই নগ্ন রূপে পাঠক কখনো নিজের জীবনের ছবি দেখতে পায়— স্বচ্ছ দর্পণের মতো। সে বলতে পারে 'সত্য যে কঠিন/কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনও করে না বঞ্চনা।' অন্যদিকে বেশ কিছু গল্পে শ্রমিক কৃষকদের সংগ্রামের— প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের দিকটিও স্পষ্ট। এবং সেই সংগ্রাম উঠে এসেছে সাধারণ মানুষের জায়গা থেকেই। কোনো উপর চাপানো নীতি আদর্শ থেকে নয়। মানুষগুলো কখনো এককভাবে কখনো দলবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছে। শরৎচন্দ্রও সাধারণ মানুষের জীবনকে অবলম্বন করেছেন। বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করের বিষয় সাধারণ মানুষ —কখনোবা। কিন্তু কেউই বাস্তবের এই নিলর্জ্জতা, কাঠিন্যকে অনাবৃত করেননি। মনে হবে তাঁরা দারিদ্র্যকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছেন। যে দারিদ্র্য আমাদের কশাঘাত করে না। সেই জীবনকে পরিবর্তনের আহ্বান করে না। সে দারিদ্র্যে গ্লানি নেই— অপমান নেই। তীব্র দহন নেই। জ্বালা নেই। শরৎচন্দ্রে হয়তো কিছুটা আছে কিন্তু সেসব গল্পেও আবেগ এবং মোহ আছে। তা যতটা কাঁদায়, আবেগে ব্যাকুল করে ততটা ভাবায় না। মানিকের স্বাতন্ত্র্য এই যে দারিদ্র্যের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা পাঠকের চক্ষু খুলে দেয়। এ জীবন যে কাম্য নয় তাকে পরিবর্তন করা দরকার; এই নির্মোহ তথ্য এবং সত্য বার্তা পাঠকের কাছে পৌঁছে যায়। মানুষ যে পশু হয়ে যাচ্ছে সে সত্য স্পষ্ট হয়। আবার সংগ্রামের দিকটিও অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে আসে। পাঠককে প্রাণিত করে। দুঃখ এবং দুঃখের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরই আহ্বানেই মানিক ছোটোগল্পে বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র এবং অনন্য শিল্পী।